ইউনিট ৪
কৃষি বনায়ন

ইউনিট ৪ কৃষি বনায়ন

কৃষি বনায়ন বিশ্বব্যাপী একটি সনাতন বহুমূখী উৎপাদন পদ্ধতি। কিন্তু বিজ্ঞান হিসেবে এর পরিচিতি নতুন। অবহেলিত এ পদ্ধতিটি ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এসে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে, যা এ শতকের শেষভাগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তত্ত্বগতভাবে কৃষি বনায়নের বহুবিধ উপকারিতার কথা বহুল প্রচলিত হলেও কারিগরিভাবে এর বিভিন্ন দিক এখনও প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে এ পদ্ধতি স্বল্পপরিসরে বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত হলেও বৃহত্তর পরিসরে এখনও তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এ পদ্ধতিকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করার জন্য

প্রয়োজন এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা, এ পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত সম্ভাব্য স্থানসম হ চিহ্নিতকরণ ও বিশদ বর্ণনা, উপযুক্ত বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ শণাক্তকরণ এবং কৃষি বনায়নের সম্ভাব্য পদ্ধতি/মডেল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা, পরিকল্পনা, উপযুক্ত বনপ্রজাতির বৈশিষ্ট্যাবলী এবং বিভিন্ন পদ্ধতি/মডেল সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৪.১ কৃষি বনায়ন ও এর প্রয়োজনীয়তা

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কৃষি বনায়ন কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- কৃষি বনায়নের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

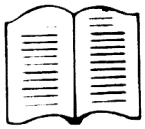

কৃষি বনায়ন

সাধারণভাবে কৃষি বলতে কৃষি জমিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্য, যেমনÑ শস্য, শাকশবজি, পশুখাদ্য উৎপাদন এবং হাঁসমুরগি, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি বুঝায়। তেমনিভাবে বনায়ন বলতে বনভূমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে বুঝায় যা থেকে সর্বাধিক পরিমাণ বনজ দ্রব্য,

কৃষি বনায়ন হচ্ছে একই ভূমি/ভূমিখন্ড থেকে যুগপৎ কিংবা পর্যায়ক্রমিকভাবে কৃষিপণ্য / ফসল এবং বনজ দ্রব্য উৎপাদন করা। এ পদ্ধতিতে বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদের সাথে ফসল/ পশুপাখির আন্তঃসম্পর্ক এবং আন্তঃক্রিয়া বিদ্যমান।

যেমনÑ কাঠ, জ্বালানি, গৃহ ও আসবাবপত্র তৈরির সামগ্রী, মধু, বনৌষধ, মোম ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু ''কৃষি বনায়ন'' শব্দটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ পদ্ধতিতে কৃষিজ পণ্য এবং বনজ দ্রব্য একইসাথে উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ কৃষি বনায়ন হচ্ছে একই ভূমি/ভূমিখন্ড থেকে যুগপৎ কিংবা পর্যায়ক্রমিকভাবে কৃষিপণ্য/ফসল এবং বনজ দ্রব্য উৎপাদন করা। অন্য ভাষায় বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল বৃক্ষের নিচে ও আশেপাশে একবর্ষজীবী ফসল উদ্ভিদ উৎপাদন করা বা কৃষি ফসলের ভিতরে/আশেপাশে বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল বৃক্ষ উৎপাদন করার প্রযুক্তি হলো কৃষি বনায়ন। বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল বৃক্ষ উৎপাদনের সাথে একবর্ষজীবী শস্য কিংবা হাঁসমুরগি ও গবাদিপশু পালনও কৃষি বনায়নের আওতায় পড়ে। সুতরাং কৃষি বনায়ন হলো এমন এক বিজ্ঞান যেখানে বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদের সাথে ফসল/পশুপাখির আন্তঃসম্পর্ক এবং আন্তঃক্রিয়া বিদ্যমান।

কৃষি বনায়ন একটি অতি প্রাচীন ও সনাতন ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন পদ্ধতি।

কৃষি বনায়ন একটি অতি প্রাচীন ও সনাতন ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন পদ্ধতি, যা যুগ যুগ ধরে কৃষকগণ অনুসরণ করে আসছেন। কিন্তু বিজ্ঞান হিসেবে এর পরিচিতি অতি সাম্প্রতিককালের। বাংলাদেশেও এ পদ্ধতি/চর্চা দীর্ঘ সময় ধরে কৃষকগণ অনুসরণ করে আসছেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ সনাতনি ধারায় একই খামারে বা ভূমিখন্ডে একইসাথে ফসল, বৃক্ষ, পশুপাখি, ইত্যাদি উৎপাদন করে আসছেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ঝুম চাষ পদ্ধতি অতি পুরাতন চর্চা। টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে এবং গাজীপুরের শ্রীপুর ও কাপাসিয়া অঞ্চলে কাঁঠাল/আম গাছের নিচে আনারস, আদা, হলুদ ও অন্যান্য শাকশবজির চাষ; সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে বনের মধ্যে লতাজাতীয় শাকশবজি,

মসলা ইত্যাদির চাষ; ফরিদপুর, বরিশাল, মাগুরা ও নড়াইল এলাকায় জমির আইলে তাল গাছের চাষ;

পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়ার গঙ্গা নদী প-াবিত উঁচু কৃষি জমিতে বাবলা গাছের চাষ অতি পুরাতন সনাতন কৃষি বনায়নের উদাহরণ। তাছাড়া বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সকল বসতবাড়ির আঙ্গিনায় কৃষি বনায়ন পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে।

কৃষি বনায়নের সংজ্ঞা

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীগণ তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষণের মাপকাঠি অনুযায়ী কৃষি বনায়নকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি নির্বাচিত সংজ্ঞা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীগণ তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষণের মাপকাঠি অনুযায়ী কৃষি বনায়নকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

Bene *et al*. (1977) এর মতে ''কৃষি বনায়ন হচ্ছে এমন একটি টেকসই (Sustainable) ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, যা ভূমির সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে, যুগপৎ বা পর্যায়ক্রমিকভাবে কৃষিজাত ফসল, বৃক্ষজাত ফসল ও বনজ উদ্ভিদ এবং/অথবা পশুপাখিকে একত্রিত/সমন্বিত করে এবং সেসব পরিচর্যা পদ্ধতি অবলম্বন করে, যা ঐ নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।'' এ সংজ্ঞাটিতে কিছুটা সংশোধন এনে King and Chandler (1978) বলেন ''কৃষি বনায়ন হচ্ছে এমন একটি সহনীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা ভূমির সার্বিক ফলন বাড়ায়, ফসল উৎপাদন (বৃক্ষজাত ফসলসহ), বনজ উদ্ভিদ এবং/অথবা পশুপাখিকে নির্দিষ্ট ভূমি/ভূমিখন্ডে যুগপৎ বা পর্যায়ক্রমিকভাবে একত্রিত/সমন্বিত করে এবং সেসব পরিচর্যা পদ্ধতি অবলম্বন করে যা ঐ নির্দিষ্ট এলাকার সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।''

Nair (1979) এর মতে, ''কৃষি বনায়ন হচ্ছে একটি ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেখানে বৃক্ষ, ফসল এবং পশুপাখিকে এমনভাবে সমন্বয়/একত্রিত করা হয় যেন সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত হয়, পরিবেশগতভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভাব্য হয় এবং সামাজিক দিক থেকে কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়''।

কৃষি বনায়ন হচ্ছে এমন একটি ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একই ভূমিতে সুবিবেচিতভাবে বৃক্ষ, ফসল ও পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়, যাতে একে অন্যের উৎপাদনকে ব্যাহত না করে, পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে এবং যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষি বনায়ন গবেষণা কেন্দ্র (ICRAF, 1983) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ''কৃষি বনায়ন হচ্ছে এমন একটি ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার মাধ্যমে একই ভূমিতে সুবিবেচিতভাবে বৃক্ষ, ফসল ও পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়, যাতে একে অন্যের উৎপাদনকে ব্যাহত না করে, পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে এবং যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়।''

Cannel (Cited by Nair, 1989) কৃষি বনায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ''একটি ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি হিসেবেÑ ক. যেখানে বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদের সাথে পশুপাখির সমন্বয় অথবা যুগপৎ অথবা ধারাবাহিকভাবে লতাজাতীয় ফসলকে একত্রিত করে মিশ্র চাষ করা হয়, এবং খ. যা কৃষি অথবা বনভিত্তিক একক ভূমি ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উৎপাদন এবং উপকারিতা প্রদান করে, যেমনÑ জমির উর্বরতা বজায় রাখা, ভূমি সংরক্ষণ, অধিকতর ফলন, ফসল বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস, পোকামাকড় ও রোগ দমন এবং/অথবা অধিকতরভাবে লোকজনের আর্থসামাজিক চাহিদা পূরণ।

Chundawat and Gautam (1993) এর মতে ''কৃষি বনায়ন হচ্ছে একটি টেকসই/সহনীয় ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি যা একই ভূমিখন্ডে খাদ্য ফসলের সাথে বৃক্ষ ফসলকে এবং/অথবা গবাদিপশুকে একত্রিত/সমন্বিত করে সার্বিক ফলন বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে এবং সেসব পরিচর্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে ঐ নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমুহের সাথে এবং ঐ এলাকার অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।''

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ''কৃষি বনায়ন হলো কৃষিজ ও বনজ উদ্ভিদের সম্মিলিত চাষাবাদ পদ্ধতি যেখানে একজন কৃষক ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করবে যা স্থায়ী হবে''।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ''কৃষি বনায়ন হলো কৃষিজ ও বনজ উদ্ভিদের সম্মিলিত চাষাবাদ পদ্ধতি যেখানে একজন কৃষক ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করবে যা স্থায়ী হবে।''

কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি ঘন বসতির দেশ। মাত্র ১ কোটি ৪৩ লক্ষ হেক্টর ভূমির উপর প্রায় ১২ কোটি লোক বসবাস ও চাষাবাদ করে। এদেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ মাত্র ০.১ হেক্টর এবং বনভূমির পরিমাণ ০.০১৬ হেক্টর। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি (বছরে প্রায় ২.১৭%) জমির উপর ক্রমাগত বর্ধিত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে অর্থাৎ মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

নিবিড় চাষাবাদ এবং অধিক ফসলের জন্য অধিক হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির গুণাগুণ ও উর্বরতাশক্তি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিজ জমির উপর চাপ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিবিড় চাষাবাদ (Intensive Cultivation) এবং অধিক ফসলের জন্য অধিক হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির গুণাগুণ ও উর্বরতাশক্তি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি জমিকে এ মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রযুক্তির প্রয়োজন যেখানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কম হবে এবং জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাবে। এজন্য অবশ্যই জমিতে জৈব সার 'হিউমাস' ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ/বনায়নের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বনসম্পদ অন্যতম। আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষ/বনায়নের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণার্থে বন তথা বনজ সম্পদ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনাঞ্চল কেটে গড়ে তোলা হচ্ছে বসতবাড়ি ও আবাদি জমি। তাছাড়া বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বাসস্থান সামগ্রী, জ্বালানি কাঠ ও নতুন নতুন শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে।

দেশে বনসম্পদ হ্রাস পাওয়ার ফলে জ্বালানি কাঠের চরম সংকট দেখা দিচ্ছে, বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়ছে, বরেন্দ্র এলাকায় মরুকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধ্বস বাড়ছে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ বাড়ছে।

ফলে বনাঞ্চল দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে এবং বৃক্ষাচ্ছাদিত বনভূমির পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাচ্ছে যা পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে একটি সংকটজনক পর্যায়। দেশে বনসম্পদ হ্রাস পাওয়ার ফলে জ্বালানিসহ প্রয়োজনীয় কাঠের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়ছে। দেশের উত্তরাঞ্চল বরেন্দ্র এলাকায় মরুকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধ্বস বাড়ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অববাহিকার বনাঞ্চল হ্রাস পাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে কোনো কোনো এলাকায় নলকুপের সাহায্যেও সহজে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। ভূমিক্ষয়ের কারণে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে যা কৃষি উৎপাদনের জন্য উদ্বেগের বিষয়। বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে । পরিবেশ দূষণের কারণে রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং তার বিপরীতে ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি ও বনভূমি দেশকে এক মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এ সন্ধিক্ষণে বনায়ন বাংলাদেশে তথা সারাবিশ্বে আলোচিত বিষয়। বনসম্পদ বাড়ানোর পরিকল্পনা আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু সীমিত ভূমি যেখানে খাদ্য চাহিদা পূরণে সক্ষম নয় সেখানে নতুন করে এককভাবে বনাঞ্চল সৃষ্টি করা কি সম্ভব? তাই বৃক্ষায়ন শুধু বনভূমিতে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ কৃষি খামারে, রাস্তার বা বাঁধের ধারে, বাড়ির আঙ্গিনায় অর্থাৎ সর্বস্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বর্ধিত জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কৃষি বনায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানব জীবনের এক মৌলিক ও অব্যাহত প্রক্রিয়া বিধায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেও শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হবে না। এ বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য কৃষি জমি বা বনভূমি অবশ্যই সংকুচিত হবে। এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য এ মুহর্তে প্রয়োজন সঠিক নীতি ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মকৌশল। কৃষি ও বনসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমনকিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যা বর্ধিত জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে এবং পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। এ প্রেক্ষাপটে ''কৃষি বনায়ন'' এক গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে এ প্রযুক্তি সফল কলাকৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । কৃষি বনায়ন হলো কৃষিজ ফসল এবং বহুবর্ষজীবী বনজ বৃক্ষের এক চমৎকার সমন্বয় যেখানে ভূমির বহুমূখী ব্যবহারের মাধ্যমে একক চাষাবাদ অপেক্ষা অধিকতর অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক উপকারিতা লাভ করা সম্ভব। সংক্ষেপে একই জমিতে কৃষি ফসল ও বৃক্ষের চাষই হলো কৃষি বনায়ন।

কৃষি বনায়ন গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

কৃষি বনায়ন গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় আনতে পারে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এতে একদিকে সৃষ্টি হবে সম্পদ অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে যা জনগণের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সার্থক কৃষিবনায়ন পরিবেশ সংরক্ষণেও এক যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে। ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তি জনগণের মাঝে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

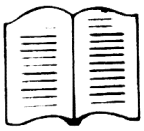

সারমর্ম ঃ কৃষি বনায়ন একটি অতি প্রাচীন ও সনাতন ভূমি ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন পদ্ধতি কিন্তু বিজ্ঞান হিসেবে এর পরিচিতি নতুন। বিভিন্ন বিজ্ঞানী কৃষি বনায়নকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সংক্ষেপে কৃষি বনায়ন হলো কৃষিজ ও বনজ বৃক্ষের সম্মিলিত চাষাবাদ পদ্ধতি যেখানে একজন কৃষক ভূমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর উৎপাদন ও মুনাফা অর্জন করবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা প রণার্থে দেশের বনসম্পদ দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে । ফলে নতুন নতুন

সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যেমনÑ জ্বালানি সংকট, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস, উষ্ণতা বৃদ্ধি, মরুকরণ প্রক্রিয়া, ভূমিধ্বংস, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস, নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি। উপরোক্ত অনাকাংখিত সমস্যা সমূহ মোকাবেলার জন্য কৃষি বনায়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া কৃষি বনায়ন গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে যা জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। নিম্নে কোন্‌টি কৃষি বনায়নের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত?
- ক) একই জমিতে কৃষি ফসল ও বন প্রজাতির চাষাবাদ
- খ) পাশাপাশি জমিতে কৃষি ফসল ও বন প্রজাতির চাষাবাদ
- গ) উঁচু কৃষি ফসলের নিচে খাটো কৃষি ফসলের চাষাবাদ
- ঘ) বৃক্ষের নিচে গুল্মের চাষাবাদ

২। ঝুম চাষ বাংলাদেশের কোন্‌ অঞ্চলের সনাতন কৃষি বনায়ন পদ্ধতি?
- ক) বরেন্দ্র অঞ্চল
- খ) মধুপুর অঞ্চল
- গ) পাহাড়ি অঞ্চল
- ঘ) উপকূলীয় অঞ্চল

৩। ''কৃষি বনায়ন কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সাথে এবং ঐ এলাকার অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপর্ণূ।''Ñ এ উক্তিটি কে করেছেন?
- ক) Bene *et al*. (1977)
- খ) Nair (1979)
- ঘ) Chundawat and Gautam (1993)
- গ) ICRAF (1983)

৪। সার্থক কৃষি বনায়ন নিম্নের কোন্‌টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
- ক) বর্ধিত জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে
- খ) খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও সৃষ্টি হবে বনসম্পদ যা গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে
- গ) পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে
- ঘ) উপরের সব কটি

পাঠ ৪.২ কৃষি বনায়ন পরিকল্পনা

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কৃষি বনায়নের সম্ভাব্য স্থান সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কৃষি বনায়নের প্রস্তাবিত সম্ভাব্য স্থানসমূহের বিশদ বর্ণনা করতে পারবেন।

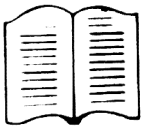

কৃষি বনায়ন পরিকল্পনা

কৃষি বনায়ন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত ও কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন কারিগরী দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবনা বা পরিকল্পনা। ভূ-কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

যথাÑ উঁচু ভূমি (High land), প্লাবন সমভূমি (Flood plain) এবং পার্বত্য অঞ্চল (Hilly area)। এ তিনটি ভূ-কাঠামো অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় কৃষি বনায়ন চর্চার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, হাওড়, বিল বা বছরের অধিকাংশ সময়ে পানি থাকে এ ধরনের স্থান এবং গভীর অরণ্যে এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কৃষি বনায়নের সম্ভাব্য এলাকা সমূহে এ কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা বা পরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন ও বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূ-কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথাÑ উঁচু ভূমি, প্লাবন সমভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চল।

কৃষি বনায়নের সম্ভাব্য স্থানসমূহ

কৃষি বনায়নের সম্ভাব্য স্থানসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোÑ

১. বসতবাড়ির আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন জমি
২. কৃষি ফসল জমি/কৃষি খামার
৩. পতিত ও প্রান্তিক জমি
৪. ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুনঃসৃষ্ট বনাঞ্চল
৫. সড়ক, রেলপথ এবং বাঁধসংলগ্ন এলাকা
৬. পুকুর, নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পাড়
৭. উপকূলীয় অঞ্চল এবং
৮. অন্যান্য উন্মুক্ত স্থান, যেমনÑ হাটবাজার, খেলার মাঠ, উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

১. বসতবাড়ির আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন জমি ঃ বসতবাড়ির আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন জমিতে কৃষি বনায়ন চর্চা এদেশের এক অতি সনাতন কৃষি প্রযুক্তি। বাড়ির আঙ্গিনা ও সংলগ্ন জমিতে একইসাথে শাকশবজির চাষ, হাঁসমুরগি ও গবাদিপশু পালন, মাছ এবং বহু রকমের ফলজ, বনজ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালা উৎপাদন/পালন বংশানুক্রমে কৃষাণকৃষাণি অনুসরণ করে আসছেন। এদেশে বসতবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকেই অধিকাংশ কাঠ, ফল, জ্বালানি, পশুখাদ্য প্রভৃতি উৎপাদিত ও সংগৃহিত হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালি জ্বালানির প্রায় ৮০% যোগান দেয় বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বসতবাড়িভিত্তিক এ উৎপাদন কৌশল

এদেশে বসতবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকেই অধিকাংশ কাঠ, ফল, জ্বালানি, পশুখাদ্য প্রভৃতি উৎপাদিত ও সংগৃহিত হয়।

তেমন ফলপ্রসূ নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশের ছয়টি প্রধান অঞ্চলে এক সমীক্ষায় দেখেছে যে, গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বসতবাড়ি এখনও সম্ভাবনার তুলনায় খুব কম ব্যবহৃত হচ্ছে । কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা, পছন্দ, প্রয়োজনীয়তা ও সম্পদ বিবেচনায় রেখে বংলাদেশে ১০ মিলিয়ন বসতবাড়ির প্রায় ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর প্রান্তিক ভূমি কৃষি বনায়ন অর্থাৎ সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামী শতকের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদার এক বিরাট অংশ পূরণ করা সম্ভব। এ সম্ভাব্য পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নে কৃষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও পরিকল্পনাকারীদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল এবং সীমিত ভূমির দেশে কৃষি খামার বনায়ন আগামী শতকের খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

২. কৃষি ফসল জমি/কৃষি খামার ঃ কৃষি ফসল জমি বা কৃষি খামারে ফসলের সাথে যুগপৎভাবে বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ উৎপাদনকে খামার কৃষি বনায়ন (Farmland Agroforestry) বা ফসলভূমি কৃষি বনায়ন (Cropland Agroforestry) বলে। এ চর্চা তুলনাম লক নতুন হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, যেমনÑ শ্রীপুর, কাপাসিয়া, মধুপুর, নরসিংদী, পাবনা, ঈশ্বরদী, নাটোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, নড়াইল, ফরিদপুর ও মাগুরা এলাকায় বহুকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল এবং সীমিত ভূমির দেশে এ প্রযুক্তি আগামী শতকের খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। নিবিড় ফসল চাষের ফলে মাটির হ্রাসকৃত ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলী পুনরুদ্ধার, ভূমিক্ষয় রোধ, খাদ্যোপাদান পুনঃচক্রায়ন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসলকে রক্ষা করতে কৃষি বনায়ন গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের কৃষি জমির প্রায় ৮০% হচ্ছে ধানের জমি। সাধারণ নিবিড় ধান চাষ এলাকায় কৃষকগণ ধানের জমিতে গাছ লাগাতে পছন্দ করে না। কারণ, গাছের ছায়া ধানের ক্ষতি করে। এসব জমির জন্য কম ছায়াদানকারী, ভারি শাখাপ্রশাখা ছাঁটাইয়ের পর বেঁচে থাকতে পারে, কম শিকড় বিস্তারকারী, মাটির গভীরে শিকড় প্রবেশকারী, 'লিগিউমিনাস' উদ্ভিদ যার শিকড় বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে সংগৃহিত করে প্রভৃতি গুণাবলীবিশিষ্ট প্রজাতির গাছ নির্বাচিত করতে পারলে অবশ্যই কৃষকগণ এ প্রযুক্তি গ্রহণ করবেন। সুইস ডিভেলপ্‌মেন্ট কো-অপারেশন (SDC) বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলায় এ কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে সম্প্রসারিত করেছে। কম উর্বর এবং স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল, যেমনÑ বরেন্দ্র অঞ্চল, যেখানে খরা, অনাবৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল প্রায়শঃই নষ্ট হয় সেখানে এ চর্চা অত্যন্ত কার্যকরী। এরই মধ্যে বিভিন্ন শুষ্ক অঞ্চলে এ কার্যক্রম বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। উপযুক্ত প্রজাতি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা কলাকৌশলের মাধ্যমে এ প্রযুক্তি আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা ও সমস্যাভিত্তিক গবেষণা।

বাংলাদেশের পতিত ও প্রান্তিক জমিতে কৃষি বনায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে বিপুল পরিমাণ খাদ্য, ফলমূল, কাঠ, পশুখাদ্য প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে।

৩. পতিত ও প্রান্তিক জমি ঃ বাংলাদেশে প্রায় ০.৩৯ মিলিয়ন হেক্টর চলতি পতিত এবং ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য পতিত জমি রয়েছে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চরাঞ্চল সৃষ্টি হচ্ছে । এসব পতিত এবং প্রান্তিক জমিতে কৃষি বনায়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে বিপুল পরিমাণ খাদ্য, ফলমূল, কাঠ, পশুখাদ্য প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রে এসব জমির সঠিক মালিকানা পাওয়া দুষ্কর বিধায় কৃষি বনায়নের পাশাপাশি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে গরু, ছাগল ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে। সুতরাং সঠিক প্রজাতি নির্বাচন, পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে কৃষি বনায়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধিত মানুষের চাহিদা লাঘবকরণ ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব। এ কার্যক্রম সাফল্যমন্ডিত ও আকর্ষণীয় করার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো সঠিক পরিকল্পনা।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮ হাজার হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। এ ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুনঃসৃষ্ট বনাঞ্চলে কৃষি বনায়ন চর্চার মাধ্যমে বনসম্পদ সৃষ্টি ছাড়াও জনগোষ্ঠীকে গঠনমূলক নিয়ামকে পরিণত করা সম্ভব।

৪. ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুনঃসৃষ্ট বনাঞ্চল ঃ এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, বর্ধিত জনসংখ্যার নিত্যদিনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশের বনভূমি প্রতিনিয়ত উজাড় হয়ে যাচ্ছে। সরকারী হিসেবে বর্তমানে মোট ১৩/১৪ শতাংশ বনাঞ্চল থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তা ৭ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে এবং দিন দিন আরও কমছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ৮ হাজার হেক্টর বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে । এ উজাড়কৃত বনভূমি অনেকক্ষেত্রে অবৈধ দখলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এসব দখলকারীদের ঝামেলা পোহাতেই বন সংরক্ষকদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হচ্ছে । বনজ সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশ আজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। অবিলম্বে এ মারাত্মক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব না হলে আগামি শতাব্দীর শেষ নাগাদ এদেশে বনভূমির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। বিগত বছরগুলোতে বনবিভাগের বনায়ন কর্মসূচি আশানুরূপ প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য, কাঠ, জ্বালানি ইত্যাদি চাহিদা নিশ্চিত না করে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল ও পুনঃসৃষ্ট বনাঞ্চলে অংশীদারিত্বের কৃষি বনায়ন চর্চার মাধ্যমে বনাঞ্চল ধ্বংস প্রক্রিয়া হ্রাস করা সম্ভব। বনবিভাগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের পর স্থানীয় গরীব কৃষকদের বৃক্ষসারির মাঝে ফসল চাষের ও ভোগ

করার অধিকার প্রদান এবং বৃক্ষ পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদানের ধারা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এতে করে জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের নিয়ামক থেকে গঠনমূলক নিয়ামকে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছে।

সড়ক, রেলপথ এবং বাঁধের দুপার্শ্বে ফলজ এবং বনজ বৃক্ষ রোপণ করে এসব বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট ফলজ উদ্ভিদ ও শাকশবজির চাষ করা যেতে পারে।

৫. সড়ক, রেলপথ এবং বাঁধসংলগ্ন এলাকা ঃ সড়ক, রেলপথ ও বাঁধের দুপার্শ্ব জুড়ে কৃষি বনায়নের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭৯১৩ কি.মি. পাকা সড়ক ও মহাসড়ক, ২১৮৬ কি.মি. আধাপাকা সড়ক, ১২৬০ কি.মি. খোয়া বিছানো সড়ক, ৩৪০০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ২৮১৮ কি.মি. রেলপথ এবং বড় আকারের বাঁধসমূহের দৈর্ঘ্য ৮০০০ কি.মি. এর উর্ধ্বে। এসব সড়ক, রেলপথ এবং বাঁধের দুধারে প্রচুর পরিমাণে ফলজ এবং বনজ বৃক্ষ রোপণের সুযোগ রয়েছে। এসব বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ধরনের ছোট ফলজ উদ্ভিদ ও শাকশবজির চাষ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ বনবিভাগ, বিভিন্ন বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এবং সড়কপথের কৃষি বনায়ন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আরও কার্যকরী কৃষি বনায়ন ধারা গড়ে তোলা সম্ভব যাতে ঐস্থানগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ছাড়াও মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে প্রচুর পুকুর, নদী, খাল, বিল ও জলাশয় রয়েছে যার পাড়ে কৃষি বনায়নভিত্তিক বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

৬. পুকুর, নদী, খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ের পাড় ঃ বাংলাদেশ পুকুর, নদী, নালা, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়ের দেশ। এসব প্রাকৃতিক জলাশয়ের আশেপাশে কৃষি বনায়নের জন্য লাখ লাখ একর জমি রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ১.৭৭ মিলিয়ন পুকুর ও দীঘি রয়েছে যার মোট আয়তন প্রায় ০.৯২ মিলিয়ন হেক্টর। অধিকাংশ পুকুর ব্যক্তিমালিকানায় ও বসতবাড়ির পার্শ্বে বা সাথে অবস্থিত। অতএব পুকুর এবং দীঘি ঘিরে কৃষি বনায়নভিত্তিক বহুমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। পুকুরে সাধারণত মাছ চাষ করা হয়। মাছ চাষের সাথে সাথে পুকুরের উপরিভাগে মাচা করে হাঁসমুরগি পালন,

পুকুরের ঢালু পাড়ে মাচার মাধ্যমে লতাজাতীয় শাকশবজি চাষ, উঁচু পাড়ে ফলজ বৃক্ষ, যেমনÑ লেবু,

পেয়ারা, পেপে ও বনজ বৃক্ষ, যেমনÑ মেহগনি, ইপিল-ইপিল, শিশু, নিম ইত্যাদি এবং বৃক্ষের সারির মাঝে মাঝে শাকশবজির চাষ করা যেতে পারে। সরকারী খাস পুকুর ও দীঘির পাড়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উপরোক্ত কৃষি বনায়ন ধারা গড়ে তোলা যেতে পারে।

বাংলাদেশের নদীসমূহের দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ২২১৫৫ কি.মি.। এসব নদী এবং খালের ঢালু পাড়, উঁচু পাড় এবং তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ এবং বৃক্ষসারির ফাঁকে ফাঁকে ফসল ও শাকশবজির চাষ করা যেতে পারে। এ ধরনের স্থানে উপরোক্ত কৃষি বনায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ছাড়াও বছরব্যাপী শবজি চাষ ও নদীর ভাঙ্গন রোধ করা যেতে পারে।

উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা, জলোচাছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতির সাথে লবণাক্ততা সহ্যকারী ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

৭. উপকূলীয় অঞ্চল ঃ বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭১০ কি.মি.। এ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে লবণাক্ততা ও উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল ফলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এসব উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততারোধী, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি রোপণ করা এবং বৃক্ষসারির মাঝে লবণাক্ততা সহ্যকারী ফসলের চাষ করা যেতে পারে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হওয়া ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মানুষ, পশু ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

৮. অন্যান্য উন্মুক্ত স্থান ঃ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানসমূহ, যেমনÑ হাটবাজার, খেলার মাঠ, উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থানে শোভাবর্ধনকারী ও ছায়া প্রদানকারী ফলজ ও বনজ বৃক্ষ লাগানো যেতে পারে। এসব বৃক্ষের সাথে লতানো বা ছায়া সহ্যকারী শবজি চাষ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত স্থানসমূহ সঠিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

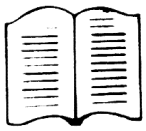

সারমর্ম ঃ কৃষি বনায়ন কার্যক্রমকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দরিদ্র জনগোষ্টিকে সম্পক্ত করে সম্প্রসারিত ও ফলপ্রসু করার জন্য সঠিক প্রস্তাবনা বা পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এদেশের অধিকাংশ স্থানে কৃষি বনায়ন চর্চা সম্প্রসারিত করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য কৃষি বনায়নের উপযুক্ত স্থানসমূহ হলোÑ বসতবাড়ির আঙ্গিনা ও তৎসংলগ্ন জমি; কৃষি খামার; পতিত ও প্রান্তিক জমি; ক্ষয়প্রাপ্ত ও পুনঃসৃষ্ট বনাঞ্চল; সড়ক, রেলপথ ও বাঁধসংলগ্ন এলাকা; নানা রকম পুকুর ও জলাশয়ের পাড়; উপকূলীয় অঞ্চল ও বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থান। সুতরাং একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা উপরোক্ত স্থানসমূহে কৃষি বনায়ন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত ও জোরদার করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ভূ-কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?
- ক) ৩টি
- খ) ৫টি
- গ) ৭টি
- ঘ) ৯টি

২। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালি জ্বালানির কত % বসতবাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি যোগান দেয়?
- ক) ৩০%
- খ) ৫০%
- গ) ৭০%
- ঘ) ৮০%

৩। সুইস ডিভেলপ্‌মেন্ট কো-অপারেশন (SDC) বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলে খামারভিত্তিক কৃষি বনায়ন কার্যক্রম সম্পসারিত করেছে?
- ক) উত্তরাঞ্চলে
- খ) পূর্বাঞ্চলে
- গ) দক্ষিণাঞ্চলে
- ঘ) পশ্চিমাঞ্চলে

৪। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রির্পোট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর কী পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে?
- ক) ৫ হাজার হেক্টর
- খ) ৮ হাজার হেক্টর
- গ) ১০ হাজার হেক্টর
- ঘ) ১২ হাজার হেক্টর

৫। বাংলাদেশ বন বিভাগ ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাসমূহের মোটামুটি সফল কৃষি বনায়ন কার্যক্রম কোন্‌টি?
- ক) বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন
- খ) কৃষি জমিতে কৃষি বনায়ন
- গ) সড়কপথে কৃষি বনায়ন
- ঘ) পুকুর পাড়ে কৃষি বনায়ন

পাঠ ৪.৩ কৃষি বনায়নে বন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যাবলী

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কৃষি বনায়নে উপযুক্ত বন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি বনায়নে প্রজাতি নির্বাচনের সময় বন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আর কী কী সাধারণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

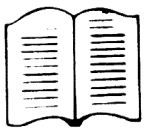

বন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যাবলী

কৃষি বনায়নে যেহেতু দুই বা ততোধিক ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ একসাথে চাষ করা হয় সেহেতু সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের ওপরই এ প্রযুক্তির সাফল্য নির্ভর করে। ভূমির উপরিভাগ ও নিম্নভাগের উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধি সম্পদসম হ (Growth resources) গ্রহণে বন প্রজাতির সুবিধা তুলনাম লকভাবে বেশি বিধায় উপযুক্ত বন প্রজাতি নির্বাচনের ওপরই সাথি ফসলের ফলাফল/সাফল্য নির্ভর করে। উপযুক্ত বন প্রজাতি নির্বাচনের সময় নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনা করা প্রয়োজন। যথাÑ

সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের ওপরই কৃষি বনায়নের সাফল্য নির্ভর করে।

- বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী, যেমনÑ খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য, বাসস্থান সামগ্রী ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পুরণকারী।
- দ্রুত বর্ধনশীল।
- স্থানীয় জলবায়ু উপযোগী।
- বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ায় ভালোভাবে জন্মাতে পারে।
- বীজ বা কাটিং থেকে সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।
- ক্ষুদ্র, সরু ও খাড়া (errect) পাতাবিশিষ্ট, যাতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক নিচের সাথি/আন্ত ঃফসলে পৌঁছাতে পারে।
- কম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ যাতে ছায়ার ব্যাপ্তি কম হয়।
- গভীর শিকড়বিশিষ্ট বৃক্ষ যাতে মাটির গভীর থেকে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করতে পারে।
- অল্পপার্শ্বীয় শিকড়বিশিষ্ট বৃক্ষ যাতে সাথি বা আন্ত ঃফসলের সাথে খাদ্যোপাদান ও পানির জন্য প্রতিযোগিতা কম হয়।
- লিগিউমজাতীয় প্রজাতি যাতে শিকড়ের সাহায্যে বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে সঞ্চিত করতে পারে।
- ভালো কপিসিং (Coppicing) ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থাৎ প্রধান কান্ডসহ সব ধরনের ডালপালা ছাটাইয়ের পর প্রচুর পরিমাণে নতুন ডালপালা ও পাতা উৎপাদিত হয়।
- ভারি বা অধিক প্র€নিংয়ের পর বেঁচে থাকতে পারে।
- উচ্চ ক্যালরিবিশিষ্ট কাঠ যা ছাই, স্ফুলিঙ্গ বা দুষিত ধোয়া ছড়াবে না।
- ছোট ও নরম পাতা যা সহজে পচে খাদ্যোপাদান সরবরাহ করবে।
- শুষ্ক পাতা সহজে ঝরে পড়ে যাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন যা সহজে পচে সার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
- প্রতিকুল আবহাওয়ায় অর্থাৎ খরা বা বন্যায় বেঁচে থাকতে পারে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
- কম উর্বর জমিতে জন্মাতে ও বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পারে।

বহুবিধ ব্যবহার, দ্রুত বর্ধনশীল, স্থানীয় জলবায়ু উপযোগী, কম শাখাপ্রশাখা ও গভীর শিকড়বিশিষ্ট, ভালো কপিসিং ক্ষমতাসম্পন্ন, শুষ্ক মৌসমে পাতা ঝরে যায় প্রভৃতি গুণাগুণবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রজাতি কৃষি বনায়নের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন।

- কম যত্নের প্রয়োজন হয়।
- রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী।
- গাছের মূল থেকে নিঃসৃত কোনো পদার্থ সাথি বা আন্ত ঃফসলের ক্ষতি করে না (Non-allelopathy) এমন প্রজাতি।

বনজ বা ফসল প্রজাতি নির্বাচনের সময় জমির পরিমাণ ও প্রকৃতি, স্থানীয় জলবায়ু, প্রজাতির অর্থনৈতিক গুণাবলী, কৃষকের চাহিদা, পণ্যের বাজার ইত্যাদি বিষয়সমূহ ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রজাতি নির্বাচনে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় সমূহ

বনজ বা ফসল প্রজাতি নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত সাধারণ বিষয় সমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন। যথাÑ

- জমির পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব ও অবস্থান।
- স্থানীয় জলবায়ু বা আবহাওয়া।
- প্রজাতির অর্থনৈতিক গুণাবলী।
- কৃষকের চাহিদা ও পছন্দ।
- উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বা বাজার।
- বংশবিস্তারের উপকরণের সহজলভ্যতা।

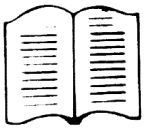

সারমর্ম ঃ কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে যেহেতু বিভিন্ন প্রজাতির একাধিক উদ্ভিদ একসাথে লাগানো হয়, সেহেতু উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন করা একান্ত আবশ্যক। এ পদ্ধতিতে বন প্রজাতির সুবিধা তুলনামুলকভাবে বেশি বিধায় সঠিক বন প্রজাতি নির্বাচনের ওপরই সাথি ফসলের সাফল্য নির্ভর করে। বন প্রজাতি নির্বাচনের জন্য অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা প্রয়োজন। যেমনÑ বহুবিধ ব্যবহার, দ্রুত বর্ধনশীল, স্থানীয় জলবায়ু উপযোগী, কম শাখাপ্রশাখা ও গভীর শিকড়বিশিষ্ট, ভালো কপিসিং ক্ষমতাসম্পন্ন, শুষ্ক মৌসমে পাতা ঝরে যায়, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী প্রভৃতি গুণাগুণ। সর্বাধিক কাম্য বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ যে বন প্রজাতিতে ঘটবে তাকেই নির্বাচন করতে হবে। বনজ বা ফসল প্রজাতি নির্বাচনের সময় ভূমির অবস্থান, স্থানীয় জলবায়ু, প্রজাতির অর্থনৈতিক গুণাবলী, কৃষকের চাহিদা, পণ্যের বাজারমূল্য ইত্যাদি সাধারণ বিষয়সম হও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। নিম্নের কোন্‌টি কৃষি বনায়নের উপযুক্ত বন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য?
- ক) সরু ও খাড়া পাতা এবং কম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট
- খ) পর্যাপ্ত শাখাপ্রখাশাবিশিষ্ট
- গ) অগভীর মূলবিশিষ্ট যাতে মাটির উপরিভাগ থেকে খাদ্য ও পানি গ্রহণ করতে পারে
- ঘ) পর্যাপ্ত ছায়াদানকারী

২। লিগিউমজাতীয় প্রজাতি কৃষি বনায়নের জন্য উপযুক্ত কেন?
- ক) বায়বীয় কার্বন গাছের ভিতর প্রবেশে বেশি সাহায্য করে
- খ) বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে সঞ্চিত করতে পারে
- গ) রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী
- ঘ) কম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট

৩। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কৃষি বনায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের কোন্‌টি বিবেচনা করা প্রয়োজন?
- ক) কৃষকের প্রজাতি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি
- খ) কৃষকের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি
- গ) কৃষকের চাহিদা ও পছন্দ
- ঘ) কৃষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা

পাঠ ৪.৪ কৃষি বনায়ন মডেল সমুহ

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কৃষি বনায়নের পদ্ধতি/মডেলসম হের নাম বলতে পারবেন।
- কৃষি বনায়নের পদ্ধতি/মডেল সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং পছন্দমতো পদ্ধতি/মডেল নিজের জন্য নির্বাচন করতে পারবেন।

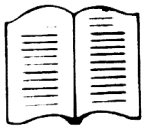

কৃষি বনায়নের পদ্ধতি/মডেল সমূহ

সাধারণত ভূমির অবস্থান ও ধরন, স্থানীয় আবহাওয়া, কৃষকের চাহিদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার উপযুক্ত কৃষি বনায়ন পদ্ধতি/মডেল নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় উপযুক্ত মডেল

সাধারণত ভূমির অবস্থান ও ধরন, স্থানীয় আবহাওয়া, কৃষকের চাহিদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার উপযুক্ত কৃষি বনায়ন পদ্ধতি/মডেল নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচনে সাহায্য করতে পারে। কৃষি বনায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো মডেল এখনও পর্যন্ত সুপারিশ করা যায় নি। কারণ এখনও বিভিন্ন পদ্ধতি/মডেলের ওপর গবেষণা চলছে বা তথ্য সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের কৃষি বনায়ন মডেল প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে ঐ মডেলগুলোর উপযুক্ততা বা সম্ভাব্যতা এখনও যাচাই করা যায় নি।

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে যেসব কৃষি বনায়ন পদ্ধতি সম্ভাবনাময় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোÑ

১. কৃষি ভূমিতে ফসল ও বৃক্ষচাষ (Agrosilviculture)
   - ক) সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন
   - খ) কৃষি জমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষ
   - গ) কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ চাষ
২. অ্যালি ক্রপিং (Alley cropping)
৩. টঙ্গিয়া পদ্ধতি (Taungya system)
৪. ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী শস্যের চাষ (Crops under shade tree)
৫. বসতবাড়ি কৃষি বনায়ন (Homestead Agroforestry)
৬. বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট বাগান (Multistrata Garden/System)
৭. ঝুম চাষ বা অনুক্রমিকভাবে বৃক্ষ ও ফসল চাষ (Jhoom or Shifting Cultivation)
৮. বৃক্ষ ও পশুপালন (Silvopastoral)
৯. ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন (Agrosilvopastoral)
১০. মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল (Agrosilvofishery)
১১. পাহাড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা বরাবর গুল্মের বেড়া (Contour Hedge) ও ফসল চাষ।

কৃষি বনায়নের পদ্ধতি/মডেল সমূহ

এখানে কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি বা মডেলসম হের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলোÑ

১. কৃষি ভূমিতে ফসল ও বৃক্ষ চাষ ঃ এ পদ্ধতিতে একই জমিতে কৃষি ফসলের সাথে যৌথভাবে বৃক্ষের চাষ করা হয়। বৃক্ষ রোপণের বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাÑ

সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে সমতল জমিতে নির্ধারিত দূরত্বে সারি করে গাছ লাগানো হয় এবং গাছের সারির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসলের চাষ করা হয়।

ক) সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন ঃ এটি একটি পরিকল্পিত কৃষি বনায়ন। এ পদ্ধতি তুলনামুলকভাবে সমতল জমির জন্য প্রযোজ্য। এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত দূরত্বে সারি করে গাছ লাগানো হয়। গাছের সারির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসলের চাষ করা হয়। কৃষি ফসল যাতে পর্যাপ্ত আলো পায় এবং খাদ্যের জন্য যাতে গাছের শিকড়ের সাথে প্রতিযোগিতা কম হয় এজন্য মাঝে মাঝে গাছের ডালপালা এবং শিকড় ছেঁটে দিতে হয়। বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সুইস ডিভেলপ্‌মেন্ট কো-অপারেশন (SDC) এ পদ্ধতির ওপর ১৯৮৭ সাল থেকে কাজ শুরু করে প্রায় ৩০০০ একর ধানের জমিতে এ কর্মসূচী সম্পসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। SDC এর পদ্ধতিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৮ মিটার (২৫ ফুট) রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বন বিভাগ একটি মডেল সুপারিশ করেছে যেখানে পূর্বপশ্চিম বা উত্তরদক্ষিণ লাইন বরাবর সারি করে (প্রতি সারিতে দুই সারি ১.৫ মি. × ১.৫ মি.) বন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়। দুই সারির মাঝখানে ৯ মিটার চওড়া জায়গা রাখা হয় যেখানে কৃষি ফসলের চাষ করা হয়।

চিত্র ২ ঃ কৃষি জমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন

কৃষি ফসলের প্রান্ত সীমায় আইলের কাছে চারিপার্শ্বে সারি করে গাছ লাগানো হয়।

খ) কৃষি জমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষ ঃ এ পদ্ধতিতে কৃষি ফসলের প্রান্ সীমায় আইলের কাছে চারিপার্শ্বে সারি করে গাছ লাগানো হয়। এ পদ্ধতিতে জমির চারিধারে ১.৫ মি. × ১.৫ মি. দ রত্বে ২/৩ সারি গাছ লাগানো হয় এবং জমির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কৃষি ফসলের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে ফরিদপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল, মাগুরা, নড়াইল ও যশোর এলাকায় জমির আইলে বিক্ষিপ্তভাবে তালগাছ ও খেজুরগাছ রোপণ করতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখ ও বহুমালিকানা এ পদ্ধতি সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়।

চিত্র ৩ ঃ কৃষি জমির প্রান্ত সীমায় বৃক্ষ চাষ

কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/ অপরিকল্পিত বৃক্ষ চাষ পদ্ধতিতে কৃষককুল তাদের প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষি জমিতে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ প্রজাতি বিক্ষিপ্তভাবে চাষ করে থাকেন।

গ) কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/অপরিকল্পিত বৃক্ষ চাষ ঃ এ পদ্ধতি বাংলাদেশের সনাতন কৃষি বনায়ন প্রযুক্তি। কৃষককুল তাদের প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষি জমিতে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ প্রজাতি বিক্ষিপ্তভাবে চাষ করে থাকেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক জরীপে দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতিতে গড়ে প্রতি একরে গাছের সংখ্যা ২০-২৫টি। বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে পাবনা, রাজশাহী ও কুষ্টিয়াতে বাবলা; রাজশাহীতে খয়ের; চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়াতে শিশু; ফরিদপুর, মাগুরা, নড়াইল ও যশোরে তাল ও খেজুর; গাজীপুরের শ্রীপুর, কাপাসিয়া এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে কাঁঠাল ও আম প্রজাতি দেখা যায়।

চিত্র ৪ ঃ কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/অপরিকল্পিত বৃক্ষ চাষ

অ্যালি ক্রপিং পদ্ধতিতে সাধারণত লিগিউমজাতীয় গুল্ম বা বৃক্ষ নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘন সারিবদ্ধ করে লাগানো হয় এবং দুই সারির মাঝে কৃষিজ ফসলের চাষ করা হয়।

২. অ্যালি ক্রপিং ঃ কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত সফল পদ্ধতি। সারাবিশ্বে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে এ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব পায় নি। সাধারণত লিগিউমজাতীয় গুল্ম বা বৃক্ষ নির্দিষ্ট দূরত্বে ঘন সারিবদ্ধ করে লাগানো হয় এবং দুই সারির মাঝে কৃষিজ ফসলের চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দুই সারির মাঝখানে তুলনামুলকভাবে বেশি ফাঁক রাখা হয় যাতে কৃষি ফসল চাষ করা যায়। তাছাড়া ফসল চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন পর্যাপ্ত আলোর প্রয়োজন হয় সেসময় গুল্ম/বৃক্ষ প্রজাতির প্র€নিং করা হয় এবং প্র€নিংকৃত সামগ্রী সবুজ অবস্থায়ই মাটির সাথে মিশিয়ে বা মাটির উপর বিছিয়ে দেয়া হয়। উক্ত প্র€নিং সামগ্রী পচে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে এবং কৃষি ফসলের খাদ্যোপাদান সরবরাহ করে। মাটির গুণাগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং কম উর্বর জমির জন্য এটি একটি লাগসই প্রযুক্তি।

চিত্র ৫ ঃ অ্যালি ক্রপিং

টঙ্গিয়া পদ্ধতিতে কৃষি ফসল ও বনজ প্রজাতি একই জমিতে একই সময়ে রোপণ করা হয়। বনজ প্রজাতির শাখাপ্রশাখা বিস্তারের ফলে নিচে রোদ কম পড়ে ও তাতে কৃষি ফসল চাষ করা যায় না। তাই শুধু বন প্রজাতিই থাকে।

৩. টঙ্গিয়া পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতি ১৮৫৬ সালে সর্বপ্রথম বার্মায় শুরু হয় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হয়। এ পদ্ধতিতে কৃষিজ ফসল ও বনজ প্রজাতি একই জমিতে এক সময়ে শুরু হয় এবং কয়েক বৎসর পর যখন বনজ প্রজাতির শাখাপ্রশাখা এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে, নিচে রোদ পড়ে না এবং আর কৃষি ফসল চাষ করা সম্ভব না, তখন শুধু বন প্রজাতিই থাকে। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে রোপিত বন প্রজাতি বড় হয়ে উপরের দিকে ঘন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কৃষি ফসল চাষ করা যায়। বন প্রজাতি পূর্ণ বিকশিত হওয়ার পর কেটে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়। পাহাড়ি বনাঞ্চলে এ পদ্ধতির বেশি প্রচলন দেখা যায়।

চিত্র ৬ ঃ টঙ্গিয়া পদ্ধতি

৪. ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী শস্যের চাষ ঃ এ পদ্ধতিতে ছায়াদানকারী বৃহৎ বৃক্ষের নিচে একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী শস্যের চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে আন্ত ঃফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাংলাদেশে চা বাগানে বিভিন্ন প্রজাতির কড়ই এবং আনারসের বাগানে আম ও কাঁঠাল গাছ দেখা যায়।

চিত্র ৭ ঃ ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী শস্যের চাষ

বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন পদ্ধতিতে শাকশবজি, খাদ্য, ফসল, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি এবং বিভিন্ন রকমের বনজ, ফলজ ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালা একইসাথে উৎপাদিত হয়।

৫. বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন ঃ এটি বাংলাদেশের এক অতি পুরাতন এবং স্থায়ী উৎপাদন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বসতবাড়িতে বসবাস ছাড়াও শাকশবজি ও খাদ্য ফসলের চাষ, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালন এবং বিভিন্ন রকমের ফলজ, বনজ ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালা একইসাথে উৎপাদিত হয়।

এখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ একই সাথে চাষ করা হয় বিধায় এটি অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও উচ্চতার গাছ এমনভাবে লাগানো হয় যাতে প্রাপ্য (available) স্থান আনুভ মিকভাবে (horizontally) এবং খাড়াভাবে (vertically) ব্যবহৃত হয়। বসতবাড়ির উৎপাদন পদ্ধতিতে সাধারণত খাড়াভাবে ৩-৪ স্তরবিশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি থাকে। উপরের স্তরে তাল, জাম, কড়ই, বাঁশ, রেইনট্রি, মেহগনি প্রভৃতি বৃহৎ বা বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট গাছ থাকে। মধ্যম স্তরে কুল, কলা, লেবু, পেয়ারা, পেঁপে, সাজনা প্রভৃতি কম উচ্চতার বা গুল্মজাতীয় গাছ থাকে। নিচের স্তরের বিভিন্ন ধরনের শাকশবজি, দানাদার শস্য, আনারস, আদা, হলুদ, মরিচ প্রভৃতির চাষ করা হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়াতে ৫ স্তরবিশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায়।

চিত্র ৮ ঃ বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন

বহুস্তরবিশিষ্ট বাগান পদ্ধতি বসতবাড়ি কৃষি বনায়নের মতোই। কিন্তু বাণিজ্যিকভিত্তিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি স্তরে এক বা দুইজাতীয় প্রজাতির গাছ লাগানো হয়।

৬. বহুস্তরবিশিষ্ট বাগান ঃ এটি বসতবাড়ি কৃষি বনায়নের মতো একটি বহুস্তরবিশিষ্ট জটিল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বসতবাড়ির স্থলে অন্য ভূমিতে বাণিজ্যিকিভিত্তিতে বাগান করা হয়। এখানে বসতবাড়ির মতো বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তে প্রতিটি স্তরে একজাতীয় বা দুজাতীয় প্রজাতি থাকে।

যেমনÑ উপরের স্তরে সুপারি, মধ্যম স্তরে পেয়ারা বা কফি এবং নিচের স্তরে আনারস, আদা বা অন্য কোনো সীমজাতীয় শবজি। ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকায় এ ধরনের বহু উৎপাদন পদ্ধতি দেখা যায় যা বাণিজ্যিকভিত্তিতে করা হয়।

চিত্র ৯ ঃ বহুস্ রবিশিষ্ট বাগান

ঝুম চাষ পদ্ধতিতে পাহাড়ি এলাকার কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জনগণ উক্ত স্থানের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল কেটে পুড়িয়ে ফেলে এবং বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর কৃষি ফসলের চাষ করে। দুতিন বছর পর জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পেলে যখন কৃষি ফসল জন্মানো সম্ভব হয় না তখন তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে।

৭. ঝুম চাষ বা অনুক্রমিকভাবে বৃক্ষ ও ফসলের চাষ ঃ ঝুম চাষ বাংলাদেশসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের প্রাচীনতম পদ্ধতি। এখনও এসব অঞ্চলে ২০০ মিলিয়ন লোক ৩০০-৫০০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বিভিন্ন নামের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিতি নাম হলো "Shifting cultivation" বা "Slash and burn method"| এ পদ্ধতিতে পাহাড়ি এলাকার কোনো নির্দিষ্ট স্থানের জনগণ উক্ত স্থানের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল কেটে পুড়িয়ে ফেলে এবং বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার পর কৃষি ফসল, যেমনÑ ধান, ভুট্টা, সীমজাতীয় শবজি ইত্যাদি চাষ করে। যেহেতু পাহাড়/ঢালুতে কৃষিকার্য করা হয়, সুতরাং ধীরে ধীরে জমির উর্বরা শক্তির ক্ষয় হয় এবং দুতিন বছর পর যখন আর কৃষি ফসল জন্মানো সম্ভব হয় না তখন উক্ত জনগণ এ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গিয়ে একই কাজ শুরু করে। পরিত্যক্ত স্থানে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিকভাবে বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। বনাঞ্চল গড়ে ওঠলে পূর্বর পদ্ধতি অনুসরণের জন্য একই স্থানে আবার তারা ফিরে আসে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ পদ্ধতি গ্রহণীয় নয়।

চিত্র ১০ ঃ ঝুম চাষ বা অনুক্রমিকভাবে বৃক্ষ ও ফসলের চাষ

৮. বৃক্ষ ও পশুপালন ঃ এ পদ্ধতিতে বৃহৎ বৃক্ষের নিচে পশুর খাদ্যোপযোগী ঘাসের চাষ করা হয় যাতে গবাদিপশু ঘাস খেয়ে জীবনযাপন করতে পারে। তাছাড়া স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন পশুখাদ্য উৎপাদনকারী গাছের সাথে পশুপালন করা হয় যাতে গবাদিপশু গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। এ পদ্ধতি সাধারণত আফ্রিকা অঞ্চল বা যেখানে প্রচুর জায়গা অব্যবহৃত থাকে ঐ এলাকায় বেশি দেখা যায়।

চিত্র ১১ ঃ বৃক্ষ ও পশুপালন

ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন পদ্ধতিতে বৃহৎ ফলজ বা বনজ বৃক্ষের নিচে একবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী কৃষি ফসল ও পশুপালন করা হয়।

৯. ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন ঃ এটি একটি জটিল পদ্ধতি। কারণ, তিনটি ভিন্ন রকমের প্রজাতি একইসাথে চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বৃহৎ ফলজ বা বনজ বৃক্ষের নিচে একবর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী কৃষি ফসল এবং পশুপালন করা হয়। বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন এ পদ্ধতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে বনজ ও কৃষিজ উদ্ভিদ এবং গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির সম্মিলিত সমাহার রয়েছে। রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে সৃষ্ট আম বাগানে সীমিতভাবে আমন ধান চাষ করা হয় এবং ধান কাটার পূর্বে পশুখাদ্যের জন্য কলাই বপন করা হয়। তারপর সেখানে পশুচারণ করানো হয়।

চিত্র ১২ ঃ ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন

মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল পদ্ধতিতে মাছ চাষের সাথে সাথে পুকুরের ঢালু পাড়ে মাঁচার মাধ্যমে লতাজাতীয় শাকশবজি ও পানির প্রান্ত সীমায় বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ এবং উঁচু পাড়ে ফলজ বৃক্ষ আবাদ করা হয়।

১০. মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল ঃ এটিও বাংলাদেশের প্রাচীনতম পদ্ধতিগুলোর অন্যতম। এ পদ্ধতিতে পুকুরে মাছ চাষের সাথে সাথে পুকুরের ঢালু পাড়ে মাচার মাধ্যমে লতাজাতীয় শাকশবজি ও পানির প্রান্ত সীমানায় কলমি, ঢোল কলমি, হেলেঞ্চাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ এবং উঁচু পাড়ে ফলজ বৃক্ষ, যেমনÑ লেবু, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদির চাষ করা হয়। ইদানিং পুকুরের পানির উপর মাঁচা করে হাঁসমুরগি পালন করতে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন ও কক্সবাজারের চকোরিয়া এলাকায় চিংড়ি চাষকৃত জমি/পুকুরে এ পদ্ধতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাহাড়ের একই সমুন্নত রেখা বরাবর লাইন টেনে দ্রুত বর্ধনশীল গুল্ম/ঝোপজাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি খুবই ঘন করে লাগানো হয় এবং দুসারির মধ্যে বিভিন্ন কৃষি ফসলের চাষ করা হয়।

চিত্র ১৩ ঃ মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল

১১. পাহড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা বরাবর গুল্মের বেড়া ও ফসল চাষ ঃ পাহাড়ি অঞ্চলে বন প্রজাতি উজাড় হয়ে যাওয়ার কারণে দ্রুত মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মাটির ক্ষয় রোধকল্পে এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাহাড়ের একই সমুন্নত রেখা (Contour line) বরাবর লাইন টেনে দ্রুত বর্ধনশীল গুল্ম/ঝোপজাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি খুবই ঘন করে লাগানো হয়। ঘন করে লাগানো উদ্ভিদ/গাছ বেড়া বা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এগুলোর উচ্চতা ১ মিটার পর্যন্ত রেখে পাতা ও ডালপালা দুই সারির মাঝখানে ছিটানো হয় যা সবুজ সার হিসেবে কাজ করে। ফলে মাটির ক্ষয় (erosion) রোধ হয় এবং মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে। দুই বেড়া/সারির মাঝখানে ক্ষয়রোধকৃত উর্বর জমিতে বিভিন্ন কৃষি ফসলের চাষ করা হয়।

চিত্র ১৪ ঃ পাহাড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা বরাবর গুল্মের বেড়া ও ফসল চাষ

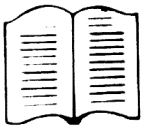

সারমর্ম ঃ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার উপযোগী কৃষি বনায়ন পদ্ধতি নির্বাচনে উক্ত এলাকার ভূমির অবস্থান ও প্রকৃতি, স্থানীয় আবহাওয়া, কৃষকের চাহিদা, সামজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সাথে তথ্য বিনিময় করে নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে চিহ্নিত কৃষি বনায়ন মডেলসমুহ সম্ভাবনাময় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। যথাÑ কৃষি ভূমিতে ফসল ও বৃক্ষ চাষ; অ্যালি ক্রপিং; টঙ্গিয়া পদ্ধতি; ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী শস্যের চাষ; বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন; বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট বাগান; ঝুম চাষ; বৃক্ষ ও পশুপালন; ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন; মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল; এবং পাহাড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা বরাবর গুল্মের বেড়া ও ফসল চাষ। বাংলাদেশে এ পদ্ধতিগুলোর উপযুক্ততা যাচাই করে দেখা আশু প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। সুইস ডিভেলপ্‌মেন্ট কো-অপারেশন (SDC) যে পদ্ধতির ওপর দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছে এবং অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে তার নাম কী?
- ক) কৃষি জমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন
- খ) বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন
- গ) জুম চাষ
- ঘ) মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল উৎপাদন

২। বাবলাভিত্তিক কৃষি বনায়ন বাংলাদেশের কোন্ এলাকাসমূহের প্রচলিত কৃষি বনায়ন পদ্ধতি?
- ক) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকার
- খ) বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা এলাকার
- গ) যশোর, মাগুরা ও নড়াইল এলাকার
- ঘ) পাবনা, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া এলাকার

৩। কৃষি বনায়নের যে পদ্ধতিতে দুই সারির মাঝে তুলনামুলকভাবে বেশি ফাঁক রাখা হয় সে পদ্ধতির নাম কী?
- ক) টঙ্গিয়া পদ্ধতি
- খ) অ্যালি ক্রপিং
- গ) বহুস্তরবিশিষ্ট বাগান
- ঘ) বৃক্ষ ও পশুপালন

৪। কৃষি বনায়নের কোন্ পদ্ধতিতে খাড়াভাবে ৩-৪ স্তরবিশিষ্ট উদ্ভিদ দেখা যায়?
- ক) অ্যালি ক্রপিং
- খ) ঝুম চাষ পদ্ধতি
- গ) বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন

ঘ) ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন পদ্ধতি

৫। বাংলাদেশের সুন্দরবন ও কক্সবাজারের চকোরিয়া এলাকার চিংড়ি চাষকৃত জমি/পুকুরে কৃষি বনায়নের কোন্ পদ্ধতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে?

ক) বৃক্ষ ও পশুপালন
খ) মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল
গ) টঙ্গিয়া পদ্ধতি
ঘ) অনুক্রমিকভাবে বৃক্ষ ও ফসলের চাষ

ব্যবহারিক

পাঠ ৪.৫ কৃষি বনায়ন পদ্ধতি/মডেল পর্যবেক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি/মডেলসম হের স্কেচ করতে পারবেন।
- কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির বাস্তব চিত্র দেখে পদ্ধতিসমুহ নিজে অনুশীলন করতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কৃষি বনায়নের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ ৪.৪ বিস্তারিতভাবে পড়ুন। এরপর এ পাঠে দেয়া বিভিন্ন মডেলের স্কেচগুলো নিজে অনুশীলন করুন। তাছাড়া এ পাঠের বিভিন্ন স্কেচ ও আলোকচিত্রগুলো দেখে নিজে নিজে পদ্ধতিগুলো অনুশীলন কর€ন।

চিত্র ১৫ ঃ কৃষি জমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়নের স্কেচ

চিত্র ১৬ ঃ কৃষি জমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়নের বাস্তব নমুনা ১

চিত্র ১৭ ঃ কৃষি জমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়নের বাস্তব নমুনা ২

চিত্র ১৮ ঃ কৃষি জমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষের স্কেচ

চিত্র ১৯ ঃ কৃষি জমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষের বাস্তব নমুনা ১

চিত্র ২০ ঃ কৃষি জমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষের বাস্তব নমুনা ২

চিত্র ২১ ঃ কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/অপরিকল্পিত বৃক্ষ চাষের স্কেচ

চিত্র ২২ ঃ কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/অপরিকল্পিত বৃক্ষ চাষের বাস্তব নমুনা ১

চিত্র ২৩ ঃ কৃষি জমিতে বিক্ষিপ্ত/অপরিকল্পিত বৃক্ষ চাষের বাস্তব নমুনা ২

চিত্র ২৪ ঃ অ্যালি ক্রপিংয়ের স্কেচ

চিত্র ২৫ ঃ অ্যালি ক্রপিংয়ের বাস্তব নমুনা ১

চিত্র ২৬ ঃ অ্যালি ক্রপিংয়ের বাস্তব নমুনা ২

চিত্র ২৭ ঃ টঙ্গিয়া পদ্ধতির স্কেচ

চিত্র ২৮ ঃ ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে একবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী শষ্য চাষের স্কেচ

চিত্র ২৯ ঃ ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে শষ্য চাষের বাস্তব নমুনা ১

চিত্র ৩০ ঃ ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে শষ্য চাষের বাস্তব নমুনা ২

চিত্র ৩১ ঃ বসতবাড়িতে কৃষি বনায়নের স্কেচ

চিত্র ৩২ ঃ বহুস্তরবিশিষ্ট বাগানের স্কেচ

ক খ

চিত্র ৩৩ (ক ও খ) ঃ বহুস্ রবিশিষ্ট কৃষি বনায়নের বাস্তব নমুনা

চিত্র ৩৪ ঃ ঝুম চাষ বা অনুক্রমিকভাবে বৃক্ষ ও ফসল চাষের স্কেচ

চিত্র ৩৫ ঃ বৃক্ষ ও পশু পালনের স্কেচ

চিত্র ৩৬ ঃ বৃক্ষ ও পশু পালনের বাস্তব নমুনা

চিত্র ৩৭ ঃ ফসল, বৃক্ষ ও পশু পালনের স্কেচ

চিত্র ৩৮ ঃ মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল চাষের স্কেচ

চিত্র ৩৯ ঃ মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল চাষের বাস্তব নমুনা ১

চিত্র ৪০ ঃ মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল চাষের বাস্তব নমুনা ২

চিত্র ৪১ ঃ পাহাড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা বরাবর গুল্মের বেড়া ও ফসল চাষের স্কেচ

চিত্র ৪২ ঃ পাহাড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা তৈরির বাস্তব নমুনা

চিত্র ৪৩ ঃ পাহাড়ের ঢালুতে সমুন্নত রেখা বরাবর গুল্মের বেড়া ও ফসল চাষের বাস্তব নমুনা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৪

সংক্ষিপ্ত ও রচনামুলক প্রশ্ন

১। কৃষি বনায়ন সম্পর্কে আপনার ধারণা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২। Bene *et al.* (1977), King and Chandler (1978), ICRAF (1983) এবং Chundawat and Gautam (1993) এর প্রদত্ত কৃষি বনায়নের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন।

৩। বাংলাদেশে কৃষি বনায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৪। বাংলাদেশে কৃষি বনায়নে সম্ভাব্য স্থানসম হ উল্লেখ করুন। উক্ত এলাকাসমুহের যে কোনো তিনটি বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

৫। কৃষি বনায়নের জন্য উপযুক্ত বন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যসম হ উল্লেখ করুন।

৬। কৃষি বনায়নের মডেল/পদ্ধতি নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়? বাংলাদেশে যে সকল কৃষি বনায়ন পদ্ধতি সম্ভাবনাময় বলে শণাক্ত করা হয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করুন।

৭। কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কৃষি জমিতে ফসল ও বৃক্ষ চাষ, অ্যালি ক্রপিং, বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন ও ঝুম চাষ পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৮। আপনার এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে এমন চারটি কৃষি বনায়ন পদ্ধতির স্কেচ করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৪

পাঠ ৪.১

১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠ ৪.২

১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। গ

পাঠ ৪.৩

১। ক ২। খ ৩। গ

পাঠ ৪.৪

১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। গ ৫। খ